বাংলাদেশের ভবিষ্যতের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

'টক অব টা টাউন' না হলেও বেশ কিছুদিন ধরে সচেতন নাগরিকদের কয়েকজন একত্রিত হলেই যে আলোচনাটি শুরু হয়, তা হচ্ছে, 'কি হতে যাচ্ছে দেশে?' বিগত প্রায় অর্ধযুগ ধরে মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা, এনজিও মালিক, ঋণদাতা সংস্থার প্রতিনিধি, বিদেশী কুটনীতিক ইত্যাদি মিলে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে আদর্শ সরকারের যে চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন, বর্তমানে ঠিক সে রকমেরই একটি সরকার দেশ চালাচ্ছে। শুধু সরকার পরিচালনাই নয় বরং বিগত ৩৬ বছর ধরে জমে থাকা সকল ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করা, সকল পাপ মোচন করা এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সব কিছু যাতে ঠিক-ঠাক চলে তার সকল ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত করাকে তারা তাদের দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। প্রথম কয়েক মাস আমরা সকলে তাদেরকে সোৎসাহে সমর্থন দিয়েছিলাম, তাদের মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে সকল কষ্ট ও নিয়ন্ত্রণকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, ততোই আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়ছে। অর্থনীতির চাকা থেমে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় চলে গেছে যে তা নিয়ে রসালো আলোচনার স্থান এখন দখল করে নিয়েছে দুর্ভিক্ষের সতর্কতা সংকেত। তেত্রিশ বছর আগে বিদায় দেয়া অশুভ শব্দটি এখন সরকারের পরম সুহৃদগণও এড়িয়ে যেতে পারছেন না। রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতার দাবীর ফল হয়েছে এই যে, এখন উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করে দিচ্ছে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কে হবে। যে নির্বাচনকে নিয়ে এতো রক্তারক্তি, সংস্কার ও পটপরিবর্তন তা আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে প্রকাশ্যেই এখন সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থা দাড়িয়েছে অদৃষ্টের হাতে সমর্পিত মানুষের মতো, যার ভবিষ্যতের উপর তার নিজের কোন হাত নেই। সে জানে না, আগামীকাল তার কি হবে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে মানুষ জ্যোতিষির কাছে যায়। জ্যোতিষি গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি দেখে এবং জাতকের উপর তাদের প্রভাব হিসাব করে জাতকের ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করে থাকেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জানার জন্যও এখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে। তবে, এক্ষেত্রে মহাকাশের জড় গ্রহের বদলে পৃথিবীর গ্রহগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় বাস্তবের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো অনেক বেশী জটিল। মহাকাশের গ্রহগুলোর চরিত্র অনেকটাই মোনোক্রোম। তাদের কেই ক্ষমতার প্রতীক, কেউ অশুভ শক্তির আর কেই বা সাফলের। পৃথিবীর গ্রহগুলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে স্বরূপ পাল্টায়, চরিত্র পাল্টায়। তারা মহাকাশের জড় গ্রহের তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধিমানও বটে। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে, রয়েছে সে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা। যে কোন ভালো পরিকল্পনাকারী একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা তৈরী রাখে। একটি পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে অন্য পরিকল্পনাটি ধরে এগোনো হয়। এভাবে অনেকগুলো পরিকল্পনা থাকার ফলে খুব কম ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে সবথেকে শক্তিশালী গ্রহ হচ্ছে আমেরিকা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খুব কম ঘটনাই পৃথিবীতে ঘটতে পারে। ফলে এই গ্রহটির চরিত্র, গতিবিধি, বাংলাদেশকে নিয়ে তার পরিকল্পনা ইত্যাদি সঙ্গত কারণেই আমাদের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলবে। সেগুলি বুঝতে হলে বাংলাদেশে আমেরিকার

স্বার্থের বিষয়গুলি বুঝতে হবে। যেহেতু আঞ্চলিক সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ভারতের অনেকটা পেটের মধ্যে আমরা রয়েছি এবং অপর শক্তি চীনের থেকে আমাদের দূরত্ব খুবই কম, তাই কৌশলগত কারণেই আমেরিকা চায় বাংলাদেশে এমন সরকার দেশ চালাক, যারা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে না।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সীমিত হলেও গ্যাস ও তেলের উপর আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলো, যাদের অদিকাংশই আমেরিকান, তাদের নযরের বিষয়টি গোপন কিছু নয়। বিগত বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই তৎকালীন অর্থ মন্ত্রী সাইফুর রহমান রব উঠিয়েছিলেন, 'মাটির নীচে সম্পদ রেখে কি হবে।' তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী অভিযোগ করেছিলেন, তেল-গ্যাস দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে নির্বাচনে হারতে হয়েছে। গত দুটি গণতান্ত্রিক সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে, শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক সরকার থাকলে বাংলাদেশ থেকে তেল-গ্যাস সহজে চুষে নেয়া বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর জন্য সম্ভব নয়। এ কারণে আমেরিকা চাইবে বাংলাদেশে এমন একটি সরকার দেশ চালাক যার তেমন কোন গণভিত্তি থাকবে না, ফলে তাকে সমর্থনের জন্য আমেরিকার দারস্থ হতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের প্রতি আমেরিকার যে মনোভাব, বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। এক্ষেত্রে দেশটি দুটি ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যে সকল দেশের প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ আগ্রাসন চালানো অথবা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করার মাধ্যমে দেশটি তাদের খনিজ সম্পদের উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অপরদিকে বাংলাদেশের মত যেসব মুসলিম রাষ্ট্রের চুরি করার মত তেমন খনিজ সম্পদ নেই, সেগুলিতে যুদ্ধাবস্থা তৈরী হোক - তা তারা চায় না কেননা তাহলে সেখানে আল কায়েদার মত জঙ্গী সংগঠনের উদ্ভব ও বিস্তৃতি ঘটতে পারে, যা দীর্ঘ মেয়াদে পশ্চিমা স্বার্থের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিতে পারে। আবার দেশগুলোতে স্থিতিশীলতা আসুক এবং তারা নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারুক, তাও দেশটি চায় না।

বাংলাদেশের অভ্রন্তরীণ বিষয়ে ইন্ডিয়ার আগ্রহ ও হস্তক্ষেপ সবথেকে বেশী। এটি অস্বাভাবিক নয়। আমাদের সীমান্তের প্রায় পুরোটাই রয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে। বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার কৌশল কয়েকটি ফ্যাক্টর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকেঃ

১. দেশটি তার প্রতিবেশীদেরকে উঠতে দিতে চায় না। শ্রীলঙ্কা ও নেপাল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি প্রকারান্তরে ভারতের অখন্ডতার জন্য হুমকী হতে পারে বলে দেশটির নীতি নির্ধারকগণের ধারণা। কেননা, বাংলাদেশের বিশাল সীমানা জুড়ে যে রাজ্যগুলো রয়েছে সেগুলির প্রায় সব কটিতেই ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের সাফল্য উক্ত রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করতে পারে।

২. পশ্চিমবঙ্গের এলিট শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এক সময় বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। তারা এখনও সে স্মৃতি ভুলে যেতে পারেন নি।

৩. বাংলাদেশ ভারতের একটি বড় বাজার। বৈধ ও অবৈধ মিলে দেশটি বাংলাদেশে বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকার দ্রব্যাদি রফতানি করে থাকে। বাংলাদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চ পদে কয়েক লক্ষ ইন্ডিয়ান কাজ করছে, যাদের অনেকেই রয়েছে অবৈধভাবে। ফলে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও

সমৃদ্ধি ইন্ডিয়ার অর্থনীতির ক্ষতি করবে। বিগত এক বছরে আমাদের রফতানীতে যে ধ্বস নেমেছে, তার প্রায় পুরো সুবিধাই নিয়েছে ইন্ডিয়া।

এ সকল কারণে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে প্রচুর বিনিয়োগ করে থাকে। দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার জাল এদেশে অত্যন্ত গভীরভাবে বিস্তৃত। সর্বোপরি, বাংলাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে ইন্ডিয়ার সম্পর্কের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। দেশটির প্রথম পছন্দ হওয়ার কথা উক্ত দলটিকে ক্ষমতায় বসানো। তবে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ অন্য কথা বলছেন। বিগত নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার নিকট থেকে দলটির নেত্রীর টাকা নেয়া এবং কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা, ব্লাসফেমী আইন প্রবর্তন ও ফতোয়াকে আইনী ভিত্তি দেয়ার মত শর্তে একটি ধর্মভিত্তিক দলের সাথে জোট বাধা প্রভৃতি কারণে দলটির নেতৃত্বকে নিয়ে ইন্ডিয়ার সন্দেহ তৈরী হয়। ফলে তারা চাইবে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক, কিন্তু দলটিকে যেন অভ্যন্তরীন সমর্থনের চেয়ে ইন্ডিয়ার উপর বেশী নির্ভরশীল থাকতে হয়। এক্ষেত্রে মাইনাস হাসিনা ফরমুলায় তাদের সায় থাকতে পারে। আবার যদি অন্য কোন শক্তি ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখভাল করার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে দেশটি তাতেও খুশী থাকতে পারে। উল্লেখ্য, এরশাদ দেশটির যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার বিষয়ে ইন্ডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় থাকলে দেশটির লাভ, এমনকি গৃহযুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হলেও তার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনীও দেশটির কাম্য নয়। দেশটির নীতি নির্ধারকগণ আমাদের সেনাবাহিনীকে জাতীয়তাবোধ ও ইসলামি মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ একটি শক্তি হিসাবে দেখে থাকে। ফলে যদি এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীকে অন্তঃকলহে লিপ্ত করা যায় কিংবা জনগণের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়ে তাকে দুর্বল করা যায়, তাহলে সে সুযোগ তারা হারাতে চাইতে নাও পারে।

ইসরাইল থেকে বাংলাদেশের দূরত্ব খুব বেশী হলেও বাংলাদেশের বিষয়ে দেশটির আগ্রহের বিষয়টি আর গোপন নেই। 'র' এর সাথে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এর সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে একসাথে কাজ করার খবর বিভিন্ন সময়ে মিডিয়াতে এসছে। অন্যান্য সকল মুসলিম দেশের মত বাংলাদেশেও তাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের স্থিতিশীলতা নষ্ট করা ও সামরিক শক্তি ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ সৃষ্টিতে কাজ করে বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বর্তমান ভূমিকার পিছনে প্রধান ফ্যাক্টর হচ্ছে দেশটির বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত রাষ্ট্রদূতের পারিবারিক রাজনৈতিক পটভূমি এবং বিগত সরকারের আমলে তাঁর উপর হামলার বিচার না হওয়া। তার এ ক্ষোভ বিগত বছরগুলোতে গোপন ছিল না এবং এক এগারোর অবস্থা সৃষ্টির জন্য তিনি চোখে লাগার মত ভূমিকা রেখেছিলেন। এদেশে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধিতে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো মত যুক্তরাজ্যও শঙ্কিত।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে মূলতঃ খৃষ্টান মৌলবাদী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ধর্মীয় মৌলবাদীদের একটি কৌশল হচ্ছে, তারা যেখানে সংখালঘু সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে। এ কারণে তারা এখানে ইসলাম ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল গোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে চাইবে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে সমর্থন জানাবে। তারা নির্বাচনকে এগিয়ে আনার ব্যাপারে চাপ

অব্যাহত রাখবে এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করার যদি কোন প্রচেষ্টা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন গড়ে তুলে এক-এগারোর মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের স্বার্থ মূলতঃ ভারতীয় প্রভাবকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে। আগের মতই দেশটি চেষ্টা করবে ডানপন্থীদেরকে ক্ষমতায় আনতে।

সউদি আরবকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে নাক গলাতে দেখা না গেলেও দেশটি আমাদের বিষয়ে একেবারে উদাসীন নয়। বাংলাদেশের সাথে দেশটির সম্পর্ক এবং স্বার্থ মূলতঃ ধর্মীয়। সংবিধানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম ও আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা থেকে শুরু করে এখানে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানো, ধর্মীয় সংগঠনগুলোর নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন জোগানোর মত কাজ তারা করে থাকে। যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকলে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি সহজ তাই দেশটি চাইবে বাংলাদেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরে আসুক। তবে দেশটি ডানপন্থীদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চাইবে এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলোর উপর কোন ধরণের দমন-পীড়নের বিপক্ষে অবস্থান নিবে। খালেদা জিয়াকে দেশের বাহিরে পাঠানোর বিরুদ্ধে দেশটির অনমনীয় অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সউদি সহায়তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সকল বিদেশী সংস্থা এবং দেশ মিলে যা দিয়েছে সউদি আরব একাই দিয়েছে সে পরিমাণ অর্থ। এর মাধ্যমে তারা ক্ষমতাশীনদেরকে বোঝাতে চাচ্ছে, তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা হলে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন ধরণের চাপ ও হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা অপ্রত্যাশিত সহায়তা করতে পারে, যা বাংলাদেশের ধ্বস নামা অর্থনীতির জন্য জীবন রক্ষাকারী ঔষধের মত কাজ করতে পারে। মাসখানেক আগে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দেশটি সফর এবং পত্রিকাতে প্রকাশিত সউদী বাদশাহের সাথে তার ঘনিষ্ঠ ছবিও গুরুত্ব বহন করে। বিশ্লেষকদের ধারণা জামায়াতে ইসলামীকে দেশটি দেখে থাকে বাংলাদেশে ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে। ফলে উক্ত দলের প্রতি দেশটি নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সহয়তা অব্যাহত রাখবে এই দলটির অবস্থান দেশটির সমর্থন নির্ধারণে ভুমিকা রাখবে। খালেদা জিয়ার প্রতি দেশটি পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে যাবে।

বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থা বাংলাদেশের রাজনীতি ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণে প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রভাব খাটিয়ে আসছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ আমেরিকার প্রভাবাধীন হলেও সংস্থাদুটি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বাংলাদেশে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সিংগভাগ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় তারা আমেরিকা ও ভারত - উভয় স্বার্থই দেখে থাকে।

এখন দেখা যাক, দেশের অভ্যন্তরের প্রধান খেলোয়াড়েরা কি খেলা খেলতে পারেন। ক্ষমতাশীন গোষ্ঠীর ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তাদের সকলেই একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন - এটি কেউই মনে করে না। বরং, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামনে বিভিন্ন লক্ষ্য থাকতে পারে। তাদের সামনে বিকল্পও রয়েছে কয়েকটি। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. একটি সত্যিকার নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে বিদায় নেয়া। এটিকে তারা খুব বেশী ঝুঁকিপূর্ণ মনে করবেন, কেননা সরকারের আর্শীবাদপুষ্ঠ গোষ্ঠী যে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

হাসিনার আওয়ামী লীগ বা খালেদার বিএনপি যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসে তাহলে তাদেরকে যারা জেলে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এমনকি পরবর্তী সংসদ কতৃক এ সরকারের কর্মকান্ডের বৈধতা দেয়ার বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

২. আমাদের দেশে ছোট-খাটো পদ ও ক্ষমতা নিয়ে যে ধরণের প্রতিযোগীতা, খুনোখুনি ও রক্তারক্তি ঘটে থাকে, তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করেও তার প্রতি কোন মোহ না জন্মানোর বিষয়টি অবিশ্বাস্য। ফলে ক্ষমতাশীনদের অন্ততঃ কেউ কেউ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত বা পিছন থেকে চালানোর পরিবর্তে সরাসরি দেশ চালাতে যে আগ্রহী হবেন না, তা বলা যায় না। এ বিষয়ে সন্দেহ বাড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনার উদ্যোগ ও রাষ্ট্রপতি পদের প্রতি কারো কারো প্রকাশ্য দুর্বলতা। এ বিষয়টি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, তারা এমন একটি দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যেতে চায়, যে দলটির একক কোন নেতৃত্ব থাকবে না এবং পরবর্তীতেও যে দলকে অরাজনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক প্লাটফরম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। অনেকটা পাকিস্তানের মুসলিম লীগের মত একটি দলই তারা চাচ্ছেন।

৩. প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষমতাশীনদের পছন্দের দল যদি সুবিধা করতে না পারে, তাহলে তারা কি করবে? এক্ষেত্রে দুই নেত্রীর কোনো একজনের সাথে সমঝোতার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। খালেদার সাথে সমঝোতার সময়ে তারা খালেদার একরোখা ও বিশ্বাসী স্বভাবের বিষয়টি মাথায় রাখবে। সমঝোতা হলে খালেদা হয়তো প্রতিষোধ নিবেন না। কিন্তু, একরোখা খালেদার অপমানজনক সমঝোতার পথে পা না বাড়ানোর সম্ভাবনাই বেশী। তাছাড়া তিনি এখন অনেক বেশী আত্মবিশ্বসী, কেননা, একদিকে যেমন তাঁকে ছাড়া বিএনপি চালানোর চেষ্টা সফল হয়নি, অপর দিকে তাঁর দুই সন্তানই জেলে। হাসিনার সাথে সমঝোতা হওয়া সহজ। এ ধরণের কোন প্রস্তাব পেলে তিনি হযতো ফিরিয়ে দিবেন না। হয়তো ইতোমধ্যে কোন সমঝোতা হয়েও গেছে। তবে তাঁর পূর্ব ইতিহাসের কারণে ক্ষমতাশীনেরা তাকে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। তার সাথে সমঝোতা করার পরও, ক্ষমতাশীনদের পছন্দের দলাংশকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনার চেষ্টা হতে পারে। এখানেই রয়েছে পরিস্থিতি পাকিস্তানের মত জটিল হবার আশঙ্কা।

৪. নিরাপদ প্রস্থান এবং তারপর উচ্চাভিলাসীদের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিশ্চিত করা না গেলে জঙ্গীবাদের উত্থান কিংবা রাজাকার নিধনের মাধ্যমে দেশে জরুরী অবস্থাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা হতে পারে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে ভিতরের অন্য খেলোয়াড় এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর ভূমিকা দেশকে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা, সেনাবাহিনীর ক্ষতিসাধন ও স্বার্বভৌমত্ব হারানোর মত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

যেহেতু বর্তমান সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল নির্বাচনকে নিয়ে, তাই নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ও আগামীর ভূমিকা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিগত প্রায় এক বছরের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না যে ক্ষমতাশীনদের কথামতই কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে। কিন্তু, কয়েকটি কারণে অনেকে মনে করছেন, নির্বাচন কমিশনারদের অন্য এজেন্ডা থাকতে পারে এবং খুব জটিল মুহূর্তে তাদের কেউ কেউ এমন ভূমিকা নিতে পারেন যাতে দেশের বড় কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন খোলাখুলিই দলটির প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, বর্তমান কমিশন আওয়ামী লীগের অন্দোলনের ফসল বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং

দলটিকে ভবিষত্যে দেশ চালানোর আসনে দেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। রাজনীতিতে বিএনপির প্রধান মিত্র যে ধর্মভিত্তিক দলগুলো তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, যুদ্ধাপরাধে তাদেরকে বিচার করার মত আওয়ামী লীগের দাবীর প্রতি তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এসব বিতর্কিত মন্তব্য সাংবাদিকদের খোচার মুখে মুখ ফসকে বের হওয়া কোন বেফাঁস কথা নয়, বরং তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করে, ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো একাধিকবার বলেছেন। তাছাড়া বিএনপির মূল ধারাটিকে নির্বাচনের বাইরে রাখতেও কমিশন প্রকাশ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে এভাবে বিতর্কিত করা শুধুমাত্র দলীয় আনুগত্য প্রকাশের জন্য ভাবলে ভুল হবে। তাদের একটি উদ্দেশ্য হতে পারে আওয়ামী লীগকে ধোকা দেয়া এবং দলটিকে এ ধারণা দেয়া যে নির্বাচন কমিশন দলটির পক্ষে রয়েছে এবং তাকে জয়ী হতে সাহায্য করবে। এর ফলে আওয়ামী লীগ, বাম দলগুলো এবং তাদের প্রভাব বলয়াধীন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া (সকল টিভি চ্যানেল ও অধিকাংশ পত্রিকাতে এ ধারার স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে) নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করবে না এবং আওয়ামী লীগও জয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নির্বাচনে যাবে।

যদি আওয়ামী লীগের প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের প্রকাশিত আনুগত্য নির্ভেজাল হয়ে থাকে, তাহলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ না জিততে পারলে তিন তাঁর শেষ চালটি চালতে পারেন। নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি দাবী করে তিনি নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দিতে পারেন। জঙ্গী আন্দোলনে পারদর্শী আওয়ামী লীগ ও তার বাম সহযোগীরা তখন আরেকটি আঠামে অক্টোবর তৈরী করতে পারে। এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটলে তা ইন্ডিয়াসহ অনেক পশ্চিমা দেশের স্বার্থের অনুকুলে যেতে পারে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে আদালতের প্রভাব বিস্তারের ট্রাডিশন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতি এখন অনেকটাই আদালতের উপর নির্ভরশীল কেননা, গণনা করার মত সকল রাজনীতিকই হয় কারাগারে না হয় বিভিন্ন মামলার আসামী। প্রশাসন থেকে স্বাধীন হওয়া আদালত এই পরিস্থিতিতে কি করে তাও দেখার বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে বিদেশী ও দেশী বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব থাকবে, রাজনীতির খেলায় জনগণ অনুপস্থিত থাকায় সে প্রভাব খুব বেড়ে যাবে এবং তাদের কেউ কেউ হয়তো এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদের লক্ষ্য অর্জনের চরম কোন পথও বেছে নিতে চাইবে। পরিস্থিতি অনেকটা অসহায় শিকারকে নিয়ে হিংস্র শিকারীদের টানাটানির মত। তাতে শিকারীদের কারো ভাগে কম কারো ভাগে বেশী পড়তে পারে, কিন্তু শিকারকে যে ছিন্ন ভিন্ন হতে হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেশের আসল মালিক যে জনগণ তারা যদি এখনই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের স্বার্থ, গতিবিধি ও সম্ভাব্য পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে তাহলে বহু শিকারীর মাঝে অসহায় শিকারের ভাগ্য করণ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকবে না।